নিউ ইয়র্কে বইমেলা ২০০৭ ও অন্যান্য

নিউইয়র্কে বিদায় মুহূর্তে লেখিকা ও গায়িকা
রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যা

রাবেয়া খাতুন

আবার যাচ্ছি নিউ ইয়র্কে। প্রতিবার ওখানে বইমেলা হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। এবারে প্ল্যান চেঞ্জ হয়েছে জানি না কেন। মেলার আয়োজন বিশাল হবে। মেলা প্রাণবন্ত হয় জ্ঞানী-গুণীজনের আগমনে। অন্তত আয়োজক মুক্তধারার বিশ্বজিৎ তেমন ধারণাই দিচ্ছিল। হয়তো তাই। কিন্তু যাবার ইচ্ছা মোটেও ছিল না। গুণীজন সান্নিধ্য অবিশ্যি কাঙিক্ষত। কিন্তু বিশ্বজিৎ অতিথি নেবার সময় যেমন বাতাসের বেগে ছোটাছুটি করে ঢাকা, কলকাতা, নিউ ইয়র্ক নিয়ে যেতে পারলে রাগটা পাল্টে যায়। কারণ দুটো হতে পারে আয়োজন অনুরূপ লোকজনের ব্যবস্থা রাখে না অথবা অনুনয় বিনয়ে যেমন করে হোক অতিথিদের নিজের এলাকায় নিতে পারলেই খুশি।

প্রথমবার গিয়ে প্রমাণ পেয়েছি। আমার আগে যারা গেছেন তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাও শুনেছি। তবু এবার যখন মার্চ থেকে ফোন করা ধরল সেটা গড়াল এপ্রিল-মে-জুন অবধি, মাথা নাড়িয়েই গেছি- যাব না। কিন্তু ওর মিষ্টি এবং লক্ষ্মী বৌ রুমা যখন দীর্ঘক্ষণ ফোন ধরে রইল তখন রাজি না হয়ে পারলাম না।

ঢাকায় তখন তীব্র গরম। ওখানকার ওয়েদারের মেজাজ চমৎকার। যেতে হবে জুনের ১৯ তারিখে। ঢাকা থেকে ড. আনিসুজ্জামান, আনিসুল হক, মাহমুদুজ্জামান বাবু, হাবিব ওয়াহিদ, কলকাতা থেকে সমরেশ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, একজন তরুণ চিত্রশিল্পী এবং লন্ডন থেকে আসবেন মধুসূদন জীবনবিদ ড. গোলাম মুরশিদ।

রাত ৯টায় এয়ার আমিরাতের প্লেন। নিশিয়ামে দুবাই পৌঁছান। বিজনেস ক্লাসে কিছু সিট খালি ছিল, এক ঝলকে সব ভর্তি হয়ে গেল। চেকিংয়ের ধকল নাকি দারুণ। ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে। উম! চেকিং হলো; তবে যেমন শুনেছিলাম তেমন নয়। বরং যতক্ষণ নতুন যাত্রী উঠল ভিআইপি লাউঞ্জে হালকা নাসতা সারা হলো। পরের সময়টুকুও বিরক্তিকর নয়। পৃথিবীর সব বড় এয়ারপোর্টেই সময় পাস করার জন্য বা কেনাকাটার জন্য শপিং সেন্টার থাকে। দুবাই সম্ভবত সবচেয়ে টেক্কা দেয়া। ইলেকট্রনিক সামগ্রী থেকে এমন কোনো জিনিস নেই যা দুর্লভ। কেনাকাটা যার নেই, উইনডো শপিং করেও তার সুন্দর সময় কাটতে পারে এমন মনোরম আয়োজন। মরু শহর দুবাইয়ের রুক্ষ জমিন সবুজ নানা রঙের ফুল ও গাছপালায় ভরা। যা দেখলে অবাক হতে হয়।

আবার যখন প্লেন উড়ল দুবাই অতিথিরা তখন ডিনার নিচ্ছে। এবারই বিরক্তিকর যাত্রা শুরু। ঢাকা থেকে দুবাই পাঁচ ঘণ্টার পথ। তার পর টানা আট ঘণ্টার দূরত্ব। নিচে আটলান্টিক, উপরে আলোহীন

অন্ধকার আকাশ। ল্যাপটপে গান শুনে বা ১৬ ইঞ্চি টিভিতে বাধ্যগতভাবে সিনেমা দেখেও সময়ের আয়ু আর ফুরায় না।

পাঁচটার দিকে টয়লেট, দাঁত ব্রাশ করতে গিয়ে দেখি পেস্ট-ব্রাশ তখনো দেয়া হয়নি। প্রতিবার এসব ব্যাপারে আমি স্বনির্ভর থাকি। এবারে ব্যাগে মেকআপ চেম্বারে সামান্য কিছু জিনিস নিয়েছি যা ফেলে দিলেও গায়ে লাগবে না। পারফিউম নিইনি। জলীয় জাতীয় কিছু ওদের আতঙ্কের মধ্যে পড়ে। কপাল খারাপ থাকলে পেস্টও ছুড়ে ফেলে দেয় সুতরাং যতক্ষণ হাওয়াই কর্মীদের হিসেবে সকাল না হলে। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। সেটা হলে তো ব্রেকফাস্ট নেই। যাত্রীরা সবাই প্রায় ঘুমাচ্ছে। নিউ ইয়র্কের কাছাকাছি পৌঁছে নাশতা। আমার আবার ঘুম ভেঙে গেলেই খিদে পায়। রক্ষা ক্লাশের কপালের বিশেষ টিপ। আপেল, সালমান ফিশ আর পাসতা এলো। তাকালাম চারদিকে। আট ঘণ্টার প্রতিবেশীরা দু'একজন ছাড়া তখনো সবাই ঘুমাচ্ছে। আমাকেও সেই চেষ্টাই করতে হলো।

অবশেষে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্র আটলান্টিক পার হয়ে দীর্ঘতম শহর নিউ ইয়র্ক পৌঁছাই। গতবার পৌঁছে এয়ারপোর্টে বিশ্বজিৎকে পাইনি। এবার শুনলাম ড. আনিসুজ্জামানের ব্যাপারেও তাই ঘটেছে। বিশ্বজিৎ পৌঁছেছে পেস্নন ল্যান্ড করার এক ঘণ্টা পর।

আমি বলেছিলাম হোটেলে নয়, কোনো বাঙালির বাসায় থাকব। গতবার বিশ্বজিৎ-এর বাসায় ছিলাম শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং আমি। এখন বিশ্বজিৎ থাকে নিউ জার্সিতে। বইমেলা নিউ ইয়র্ক কুইন্স লাইব্রেরিতে। দু'সিটির দূরত্ব ৩০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি। সুতরাং অতিথিদের রাখার ব্যবস্থা নিকটতম স্থানে যেমন- সস্ত্রীক ড. আনিসুজ্জামান এবং আমি যাব জ্যামাইকার ফাহিম অনুর বাসায়। আনিসুল হক সাগরদের এক বন্ধু আজকের কাগজের এক সময়কার সাংবাদিক মঞ্জুর বাসায়। সঙ্গীত শিল্পী মাহমুদুজ্জামান বাবু মন খারাপ করে ছিল একটু। আরো চারজনের সঙ্গে শেয়ার করে তাকে থাকতে হবে বিশ্বজিৎ-এর নিউ ইয়র্ক বাড়ির দোতালায়। বেসমেন্টে তোলা হয়েছে কুদ্দুস বয়াতী ও তার দল। তাদের নাকি চাল, ডাল, আলু কিনে দেয়া হয়েছে। নিজেরাই রান্নাবান্না করে খাবে। সমরেশ মজুমদারকে হোটেলে। হাবিব এবং ফেরদৌস ওয়াহিদকেও। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমেরিকাতেই আছেন। এখনো যোগ দেননি। সময় প্রকাশনার মালিক ফরিদ আহমেদ এবং অনন্যার মনিরম্নল হক আগেই এসে উঠেছিলেন তাদের আত্মীয়দের বাড়ি। উদ্দেশ্য পার্সেলে ঢাকা থেকে অনেক বই পাঠিয়েছেন, মেলা শুরম্ন হবার আগে সেগুলো ছাড়ান। বিশ্বজিৎ সময়মতো ছাড়ায়নি। মাথায় হাত। এখন চেষ্টা চলছে। না-হয় এবারের বইমেলায় গায়করা যোগ হয়েছে; কিন্তু মূলত বই মেলাকে কেন্দ্র করেই তো। সেই বই রয়েছে আটকা পড়ে। মাঝে মাত্র সময় সামান্য। এর মধ্যে বই খালাস করতে না পারলেঃ।

ওদের সমস্যাটা ভাবার মতো। আমার বাক্স ফাহিমের ওখানে রেখে রাতের খাবার মঞ্জুর ওখানে। ও এবং ওর শিক্ষায়িত্রী বৌ যতবার নিউ ইয়র্কে গেছি ততবারই খোঁজখবর আদর-যত্নের ত্রম্নটি রাখেনি। আমি ঢাকা থেকে এসেছি আমার জামাই মামুনের সঙ্গে। ব্যবসার খাতিরে ওর আসা। রাত ১২টায় ড. আনিসুজ্জামান ও আমাকে পৌঁছে দিয়ে ও চলে গেল হোটেলে। তখনো গৃহস্বামী বা গৃহিণীর সঙ্গে ভালো করে দেখা হয়নি। পাড়া প্রায় নিস্তব্ধ। ড্রয়িংরম্নমে আমাদের জন্য জেগে অপেক্ষা করছে ফাহিম। দোতলায় পাশাপাশি দুটি রম্নমে আমাদের থাকার ব্যবস্থা। রাস্তার ধারে সুন্দর সাজানো ঘর। আপনি ঘুম এলো।

সকালে আমি তো দেরি করে উঠি। সস্ত্রীক আনিসুজ্জামান তখনো নাশতা শেষ করেননি। গৃহস্বামীনী জাকিয়া অনু সবাইকে পরোটা, ভাজি গোস্ত, চা কফি দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে চমৎকার আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। বুঝলাম আনিসুজ্জামান দম্পতির সঙ্গে দীর্ঘ দিনের আলাপ। আমি নবাগত। কি জানি কি জাদুতে প্রবাসে বাঙালিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া যায়। ফাহিম অনুর সঙ্গেও তাই হলো। ফাহিম একাত্তরের ১০ ডিসেম্বর ইত্তেফাকের ওপর তলার কর্মী মরহুম সিরাজুদ্দিন হোসেনের মেজ ছেলে। তাকে যখন পাক আর্মিরা এক কাপড়ে ধরে নিয়ে যায়, ওরা ক'ভাই তখন খুবই ছোট। মিসেস আনিসুজ্জামান বললেন, আমরা যখন খবর পেয়ে গেলাম, ওর মা তখন অঝোরে কাঁদছেন। বুকের কাছে আড়াই বছরের ছোট ছেলেটা। সারা বাড়িতে কান্নার রোল। সহ্য করা যায় না সে দৃশ্য।

ফাহিম বলল, সত্যি আজও স্মৃতিতে শিউরে ওঠার মতো অবস্থা। আমরা তবু প্রতিদিন আশা করছি বাবা ফিরে আসবেন। দেশ স্বাধীন হবার পর রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে কেউ কেউ বললেন তার সঙ্গে মেলে এমন কঙ্কালের দেখা হয়েছে। মরা আধগলা লোকের সঙ্গে বাবাকে মেলাতে গিয়েছি; কিন্তু মেলেনি। ডিসেম্বরের রাতে তাকে শুধু একটি শার্ট আর চোখ বাঁধার জন্য একটা গামছা, ব্যস, আর কোনো কাপড় নয়। তেমন কাউকে খুঁজে পাইনি। মা যে কী কষ্ট করে আমাদের মানুষ করেছেন!

অনু বলল, মাঝে মাঝে আসেন নিউ ইয়র্কে। বলেন বিদেশে বেড়াতে আসব, থাকতে নয়। তার কবর ঢাকাতে নেই বটে কিন্তু সমস্ত স্মৃতিজুড়ে তিনি। সেখানেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেব।

অনুকে প্রথম দেখছি। বাঙালি মেয়ের তুলনায় রীতিমতো লম্বা। পাঁচ, চার। শক্ত শরীর, অসম্ভব খাটতে পারে। প্রবাসী অন্য বৌদের মতো চাকরি করে না। সারা দিন সংসারের দেখাশোনা। স্বামী এবং ২০ বছরের ছেলে তন্ময়। বাগান, বেসমেন্টের তদারক, কাজ করছে লুইস আর বব। কাজ শেষে ওটা ভাড়া খাটবে। সকালের নাশতা যে যখন সুযোগ পায় করে। রান্নাটাও। ফ্রিজে থাকে মালয়েশিয়ার তৈরি পরোটা, সমুচা। নিরামিষ বা গোস্ত নিজেরা করে নেয়। খেতে খেতে নানা গল্প। আন্তরিকতায় মনেই হয় না কাল সকালেও ওরা ছিল অপরিচিত।

আগামীকাল শামসুর রাহমান প্রাঙ্গণে বইমেলার উদ্বোধন। উদ্বোধক ড. গোলাম মুরশিদ। তিনি লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্ক পৌঁছে দেখা করতে এলেন আনিসুজ্জামানের সঙ্গে। ছোটখাটো স্বল্পভাষী। ১৯৮৪ সাল থেকে লন্ডন প্রবাসী। তার গবেষণাজাত গ্রন্থের মধ্যে 'আশার ছলনে ভুলি' অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছে। সেদিন সেই আলোচনাই হচ্ছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে গত এক শতাব্দী ধরে অসংখ্য আলোচনা হয়েছে। মাদ্রাজ থেকে ফ্রান্স অবধি নানা স্থানের অসংখ্য তথ্য এবং তার অসামান্য বিশ্লেষণ, কবির অন্তজীবন, সাহিত্য জীবন অন্বেষায় লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম। এবারের বই মেলায় তাকে সংবর্ধিত করা হবে।

তিনি উঠলেন। আমরা লাঞ্চের জন্য আমন্ত্রিত ছিলাম ইমপ্রেসের নিউ ইয়র্কের পড়শী থেকে একটি হোটেলে। শুক্রবার গাড়িতে গাড়িময় রাস্তাঘাট উইকএন্ডে যেন সব ছুটছে বাইরের দিকে। রুদ্র প্রকৃতি। ঢাকায় চলছিল একটানা দমবন্ধ গরম। এখানে এসেও দেখি তাই। আমরা পৌঁছানোর আগেই নাকি বৃষ্টি ছিল। ঠাণ্ডা ছিল ওয়েদার। এখানে গরম পড়ে না। কিন্তু গ্রীষ্মে কখনো লু হাওয়া বয়। রক্ষা এখনো সেটা শুরু হয়নি। আমাদের সঙ্গে এসেছিল এক মহিলা ফর্সা-সুমুখী-সুদেহী। রাত্রে কোথাও গেল না। বলল, হয় বেসমেন্টে নয়, উপরের বাড়তি ঘরে রাত কাটাবে।

তার সঙ্গে পরিচয় হলো। কবি শহীদ কাদরীর প্রথম স্ত্রী পেয়ারা। বয়স ৬০। দ্বিতীয়বার তাকাতে হলো। বোঝার উপায় নেই অত বয়েস। খুব হাসে। হাসতে হাসতেই গল্প করে। বর্তমানে জার্মানিতে থাকেন। নিউ ইয়র্কের সঙ্গে তার নাড়ির টান। কিন্তু থাকার কোনো জায়গা নেই। যখন যার বাসায় সুযোগ সেখানেই থাকেন। খাওয়ারও ঠাঁই-ঠিকানা নেই। যে বাড়িতে রাত, সে বাড়িতেই পাত। বাঙালি পরিবারগুলো এটা যেন মেনেই নিয়েছে। হাসতে হাসতে বলে, ছেলের বয়েস হলো প্রায় ৩০। দ্বিতীয়বার বিয়ে আর করিনি। সবার ঘরই আমার ঘর। না না শহীদ কাদরীর কোনো দোষ নেই। আমিই উড়নচণ্ডী। ঘর-সংসারে আমারই মন বসে না। যেখানে রাত, সেখানেই কাত।

সকাল বেলা নেমে এলেন গ্রামের মেয়ের মতো একপেঁচা শাড়ি জড়িয়ে। অনুর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট তৈরিতে হাত লাগাল। সময় মতো ফিটফাট হয়ে টিন এজ মেয়ের মতো পায়ে চার ইঞ্চি হিল এবং নূপুর পরল।

আজ শনিবার। বইমেলা চলবে এক মাস ধরে। সপ্তাহের মাত্র দুটি ছুটির দিনে। শুরু নিউ ইয়র্ক, ডালাস, লস অ্যাঞ্জেলেস হয়ে শেষ নিউ জার্সিতে। আমি আগেই বলেছিলাম দু'সপ্তাহের বেশি থাকা সম্ভব নয়। দলের মধ্যে একমাত্র আনিসুল হক ওই সময় আসবে। ঠিক হয়ে আছে আমি আর আনিস এক সঙ্গে ফিরব।

সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মূল অনুষ্ঠান। একটা সূচিপত্র অবিশ্যি ধরিয়ে দিয়েছে বিশ্বজিৎ আসার দিন বলেছে, সেটা পারফেক্ট নয়। নতুনটা পরে দেব। সেটা হাতে আসেনি। ঘটনাস্থল কুইন্স লাইব্রেরির সেন্ট্রাল মিলনায়তন। আমাদের কারো কোনো ধারণা নেই সে জায়গা সম্পর্কে। অনু বলল, আমারও নেই। তবু আমিই আপনাদের নিয়ে যাব। গাড়ি ড্রাইভ তো আমাকেই করতে হবে। ফাহিম চালাতে জানে না।

কোথায় ফাহিম। তার রয়েছে কিছু সঞ্চালকের দায়িত্ব। সে এবং ফেরদৌস সাজেদিন সকাল করেই চলে গেছে।

আমরাও পৌঁছালাম মোবাইলের নির্দেশে ঠোক্কর খেতে খেতে। গোলাম মুরশিদ তখনো এসে পৌঁছাননি। পথে বিভ্রাট ঘটেছে। অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন সাংঘাতিক দুর্ঘটনা থেকে।

স্বাগত বক্তব্য রাখলেন ড. আনিসুজ্জামান, সমরেশ মজুমদার, মঞ্জুর আহমদ, জ্যোতির্ময় দত্ত, আমি এবং প্রেসিডেন্ট সাগুয়ার্ডিয়া কলেজের গেইল ও মোল্ড। প্রবাসী লেখকদের নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচনে অংশ নেবেন তাজুল ইসলাম, ওবায়দুলস্নাহ মামুন। উন্মোচক ড. আনিসুজ্জামান।

উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি করা হয়েছে রবীন্দ্র মঞ্চ ও নজরম্নল মঞ্চ। সাজানো হয়েছে পরিপাটি ও সুন্দরভাবে। মেলার আয়োজনও বিশাল। কিন্তু বই কোথায়? সাধারণত এসব মেলাকে উপলড়্গ করে মহিলারা খাবার, পোশাকের, নকল অলঙ্কারের স্টল দেয়। সেগুলো আছে। টুপি মাথায় কয়েকজন লোক বসে আছে ধর্মীয় গুটিকতক বই নিয়ে। আসল বইয়ের স্টল নেই। থাকবে কি করে? ফরিদ এবং মনিরের মুখ শুকনো। তাদের বই রিলিজ হয়নি তখনো। বিশ্বজিৎ নানা অজুহাত দেখাচ্ছে। রম্নমার সঙ্গে দেখা। তাকে চেনাই যায় না। গেঞ্জি-জিন্সে, হাতের নখের খানিকটা সাদা, খানিকটা নেলপলিশ। পোশাক শুধু নয়, ভেতরেও বদলে গেছে। স্বামীর মতো সেও কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না এখন।

বইমেলায় বই না দেখে অতিথিরা আহত। এবারে টিকেটেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। জ্যামাইকা, নিউ জ্যার্সি, ম্যানহাটান থেকে উপচেপড়া ভিড়। সবারই এক কথা, বই মেলায় বই কোথায়?

গতবার ছিল। এবার আয়োজকরা ব্যস্ত মনে হলো শ্রীকান্ত আচার্য আর হাবিবের অনুষ্ঠান নিয়ে। আমাদের লেখক পাঠকের অনুষ্ঠান মুখোমুখি সাড়ে ৩টার দিকে। বিশ্বজিৎ-এর কথা ছিল যারা এখানে যোগ দেবে তাদের দ্বিপ্রাহরিক খাবার ব্যবস্থা আগেই হবে। বেলা ১১টা থেকে বিশ্বজিৎ-এর বক্তব্য বিরিয়ানি আনতে লোক গেছে।

সেটা বেলা সাড়ে ৩টাও অবিশ্যি পৌঁছাল না। আমরা ডায়াসে চলে গেলাম। অতিথি লেখকদের সঙ্গে আলাপচারিতা। নজরম্নল মঞ্চে। শুরম্নতেই নিজেদের পরিচয় নিজেরা দেওয়া। তারপর শুরম্ন হলো শক্ত বিষয় নত্ববিধান ও প্রমিত সাহিত্য বিষয়ক সাবজেক্ট। অংশগ্রহণে ড. আনিসুজ্জামান, আমি, সমরেশ মজুমদার, কংকাবতী দত্ত, আনিসুল হক। সঞ্চালক জ্যোতির্ময় দত্ত বাংলাদেশের লেখকদের সম্পর্কে যার ধারণা অতি সীমাবদ্ধ। এক সময় তাকে বললাম, আমাদের সম্পর্কে এত কম জানেন। তিনি কিছু লজ্জিত এবং বিনীত ভঙ্গিতে তার অজ্ঞতা স্বীকার করলেন।

আলোচনার এক পর্যায়ে দু'দেশে বই আদান-প্রদানের পুরনো বিষয়। সমরেশ মজুমদার বললেন তাদের আগ্রহ প্রচুর পূর্ব বাংলার সাহিত্য নিয়ে। কিন্তু বই বা সংবাদপত্র পান না ইত্যাদিঃ। উপরোক্ত পশ্চিম বাংলার বই পাইরেসি নিয়েও জোরালো প্রতিবাদ জানালেন।

দর্শক সারি থেকে একটু ড়্গুব্ধ ও রাগতভাবে উঠে দাঁড়ালেন সময় প্রকাশনের ফরিদ আহমেদ। বললেন, বই যে কেন যেতে দেয়া হয় না। দীর্ঘ দিন চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে আমরা সফল হতে পারিনি। ব্যাপারটা রহস্যময় থেকে গেছে সাধারণ পাঠকের কাছে। শুধু বই কেন, এখানকার পত্রপত্রিকাও ঢুকতে দেয়া হয় না। অচ্ছুতের মতো তা রাখা হয় কাঁটাতারের বাইরে। আর পাইরেসির কথা সমরেশ মজুমদার

বললেন, আমরা জানি এই আইনবিরুদ্ধ কাজটির মূলে কলকাতার লেখকরাও কম দায়ী নন। আর্থিক সুযোগ তারা ঠিকই নেন; তবে আইন বাঁচিয়ে। এদিকে বলে বেড়ানঃ ইত্যাদি।

দু'জনের কথা কাটাকাটি শুরু হলো এবং সেটা চরমে যাবার আগে ঘোষণা দেয়া হলো সময়সীমা শেষ। এই নিয়ে আরো একটি আসর ছিল। বিষয় : এপারের বই ওপারে চলে না। অংশ নিয়েছিল মাওলা ব্রাদার্সের প্রকাশক আহমেদ মাহমুদুল হক, সময়ের ফরিদ আহমেদ, অনন্যার মনিরুল, লেখক প্রদীপ সাহা, তারিক সুজাত, কংকাবতী দত্ত। সেটাও ধরি মাছ না ছুই পানির পর্যায়ে।

সময় ঠিকমতো মেইনটেন করা হয়নি। এদিকে সন্ধ্যা সমাগত। ডাইনিং হলে এসে শুনি তখনো দুপুরের খাবার নিয়ে লোক পৌঁছেনি। সকাল থেকে যেমন শুনছি তাতে খাসি জবাই দিয়েও অনেক আগে বিরিয়ানি তৈরি হয়ে যেত। পাওয়া গেল সমুসা, প্যাটিস, কেক। তাও কিনে খেতে হবে। বিশ্বজিৎ-এর শাশুড়ি আর শালা মিলে যে স্টল দিয়েছে সেখান থেকে। অনু কিনতে গিয়ে বলল, এরা দিনেদুপুরে ডাকাতি করছে। সমুসা আর প্যাটিসের দাম ডাবল।

ক্ষুধার তাড়নায় অনেকেই কিনে খাচ্ছে। অবশেষে এলো বিরিয়ানি সঙ্গে বিশ্বজিৎ। সবার খিদে মরে গেছে ততক্ষণে। আমাদের টেবিলের ড. আনিসুজ্জামান, ড. গোলাম মুরশিদ আমরা এবং ফরিদের দল অবেলায় কেউ খাবার ধরলাম না। কেউ কেউ কেক আর সমুসা নিল। দুর্মুখ কেউ মন্তব্য রাখল, শাশুড়ির সমুসা বিক্রির জন্য এই কৌশল। দুপুরের খাবার হাজির হয় সন্ধ্যায়। পথ দুর্ঘটনার জন্য গোলাম মুরশিদ ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারেননি। সুতরাং সকালের সংবর্ধনাটি হলো সন্ধ্যায়।

এখানে-ওখানে অনুষ্ঠান লেগেই থাকল। কোথাও দর্শক হাতেগোনা। কোথাও একদম নেই। তবে গানের অনুষ্ঠানে লোক হলো। টিকেট ২০ ডলার। ১০০ ডলার শুনলাম। ঢোকায় দারুণ কড়াকড়ি। আমাদের জন্য সব শিথিল জানতাম। তা নয়। তখনি মনে পড়ল ব্যাগে রয়েছে ফরিদের দেয়া দু'দিনের টিকেট। পুলসেরাত পার হওয়া গেল তা দিয়ে।

স্থানীয় শিল্পীদের প্রোগ্রাম শেষে কুদ্দুস বয়াতীর গান। তেমন জমলো না। কিছু কারণও ছিল। বয়াতী ডায়াসে এসেই দুঃখ প্রকাশ করল তার জন্য সময় ধরে দেয়া হয়েছে ১৫ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে সে আর কি গাইবে। গান শেষে সে বলল, এবার গান করবে আমার একটি ছুট্টু পরিবার আছে সে।

স্টেজেই ছিল বৌটি। বয়স ১৮ কি ১৭ বছর। হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল বয়াতীর যুবক ছেলে। মেয়েটির হাতেও যেন কি ছিল; কিন্তু গানে কোনো আড়ষ্টতা ছিল না।

এরপর পরিবেশনা মাহমুদুজ্জামান বাবুর। নিউ ইয়র্কে মনে হলো সে বেশ জনপ্রিয়। গাইতে এসে সেও খানিকটা ক্ষোভ, খানিকটা দুঃখবোধের ভেতর থেকে বলল, আমি আপনাদের গান শোনাতেই এসেছি; কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাকে সময় দিয়েছে মাত্র ২০ মিনিট। ৪-৫টা গান আমি শোনাতে পারব।

আসর খুব মাতালো সে। প্রচুর হাততালি নিয়ে 'আমি বাংলার গান গাই'-এর গায়ক বিদায় হলো।

অনুষ্ঠান হচ্ছিল রবীন্দ্র মঞ্চে। শেষ আকর্ষণ শ্রীকান্ত আচার্য। তার স্টেজ সাজানো ও নানা রকম নির্দেশনায় কেটে গেল অনেক সময়। গাইলেন প্রায় ঘণ্টা খানেক। রবীন্দ্রসঙ্গীত। কয়েকটি গান খুব প্রাণবন্ত হলো। রাত তখন ১২টা। রক্ষীরা হলেন সব দরজা বন্ধ করে খোলা রেখেছে মাত্র একটি দুয়ার। ভিড় ভেঙে বাইরে এসে যখন দাঁড়ালাম আমাদের চালকের জন্য মুশকিল হলো পথ চেনা। এদিকটা তার খুব পরিচিত নয়। একটি গাছতলায় জনাব ও বেগম আনিসুজ্জামান, মনির, ফরিদ, অনেকে জমায়েত থাকলাম। বাকিরা বেরোলো গাড়ি খুঁজতে। কেউ কেউ এমন আশঙ্কাও করতে লাগল, পুলিশের কব্জায় পড়ল নাকি গাড়িগুলো!

না তেমন দুর্ঘটনা ঘটেনি; কিন্তু বিরাট এলাকায় অনুকে গাড়ি খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট করতে হলো। বাড়ি ফিরতে মেলা রাত হলো। আলাপ-আলোচনায় আরো রাত।

সকালে দেখি ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। গরম কাটছে না। দিনভর থেমে থেমে বৃষ্টি তবু। পাঠক লেখক ফোরামে আমার প্রোগ্রাম তিন থেকে চারটার মধ্যে। তাড়া নেই সকাল করে ওঠার। চায়ের টেবিলে খানিকটা আড্ডা মেরে আনিসুজ্জামান এলেন লেখার টেবিলে। কি যেন অনুবাদ করছেন। আমার বেশ লাগে, এরা বাইরে এসেও দিব্যি লিখতে পারেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে দেখতাম হাতের কাছে যে বিষয়েই বই পাচ্ছেন একটানা পড়ে যাচ্ছেন। এই লেখা এবং পড়া সবাই পারে না। আমি তো এক্কেবারে না। এমন কি দৈনিক পত্রিকা, টেলিভিশন, তখন যে গান শোনা, কিছুই হয় না। তবে করি কি? জমিয়ে গল্প করা আমার স্বভাবে নেই। সেটা যদি হয় তবে অপরপড়্যোর গুণে। অপর পড়্যাটি ছিল বেগম আনিসুজ্জামান। তিনি দেখতে যেমন স্নিগ্ধ-শান্ত, সুন্দর কথা বলেনও তেমনি মোহময়ী ভঙ্গিতে। আমেরিকায় তো সহজে আসা হয় না। এই সুযোগে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াবেন। আরো কত গল্প। আমি মুগ্ধ শ্রোতা। এ্যানির সঙ্গে দেখা হয়েছে বইমেলায়। ওদের ওখানে যেতে হবে।

সকালের দিকে ফোন করেছিলাম প্রবাসী কবি শহীদ কাদরীকে। বর্তমানে তিনি এ শহরেরই বাসিন্দা। দ্বিতীয় স্ত্রী কালো আমেরিকান, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। এখন ঘরণী বাঙালি রমণী। ছুটির দিন। কিন্তু ফোন কেউ ধরল না। দুপুরে আবার করলাম, না, তিনি নেই। ফোন ধরল তার স্ত্রী। বলল, সে তো ম্যানহাটন গেছে। একেবারে সুস্থ নয়ঃ আপনার সঙ্গে আমার মুখোমুখি পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি; কিন্তু বিশ্বাস করুন বাংলাদেশে যখন ছিলাম, আপনি ছিলেন আমার এক নাম্বার পছন্দের ঔপন্যাসিক। শহীদ বাসায় থাকলে খুব খুশি হতোঃ ও যখন ফিরবে, আপনি তখন বইমেলায় থাকবেন। খুব ইচ্ছা ছিল যাব ওখানে; কিন্তু ওকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হয়। চাকরি একটা করি না করলেই নয় বলে। কাল কখন বাসায় থাকবেন বলুন, আমি ফোন ধরিয়ে দেব। ওর জন্য দোয়া করবেন ভীষণ অসুস্থ।

আমার খুব ইচ্ছা ছিল তার সঙ্গে শুধু কথা নয়, অনুর বাড়ি থেকে তার বাসা খুব দূরে নয়। দেখা হলে জিজ্ঞেস করব বাংলাদেশের এত বড় কবি হয়েও দেশপ্রিয় কবি হয়েও প্রবাসে এতকাল কেন?

অনুকে বলে রাখলাম কালকে হাতে সময় রাখতে। সে বলল, আমার আর ফাহিমেরও তো সে প্রিয় কবি; কিন্তু প্রতিবেশী হলেও কেন যেন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। নিশ্চয় কাল সঙ্গে যাব।

দুপুরে খেয়ে বইমেলায়। আজ ভিড় আরো বেশি। প্রথম আকর্ষণ গায়ক হাবিব। দূর থেকে যারা এসেছে তারা দুঃখ করছিল গানে গানে রাত হয়ে যাবে বলে। পরদিন সোমবার অফিস ডে। অন্যদল ক্ষোভ প্রকাশ করছিল টিকেটের একশ ডলার দামে। কিছু লেখক এবং আমার কয়েকটা বই নিয়ে দুর্বল একটা স্টলের দেখা মিলল; কিন্তু ফরিদ, মনিরের বই আজো ছাড়ানো হয়নি। বিশ্বজিৎ হাবিবকে নিয়ে ব্যস্ত।

ফাহিম রেজার পরিচালনায় ‘কেন লিখির’ অনুষ্ঠান সমরেশ মজুমদার, আনিসুল হক, ফকির ইলিয়াস, তারিক সুজাত এবং আমি অংশ নিচ্ছি। প্রায় সভায় মূল কথায় এটা ধরা পড়ল কলমের প্রতি ভালোবাসাই তাদের লেখার মূল উৎস।

মা মেয়ের গল্প। মেয়েদের আড্ডা। মূল বক্তব্য মায়ের সঙ্গে মেয়ের জেনারেশন গ্যাপের মধ্যেও কেমন সম্পর্ক। বিশেষ অতিথি রাবেয়া খাতুন। পরিচালনা ভয়েস অব আমেরিকার জাকিয়া খান। অংশগ্রহণ করলেন দু’জোড়া মা-মেয়ে। অনুষ্ঠান যখন বাঙালিদের মধ্যে, সেন্টিমেন্ট বা মূল বক্তব্য যখন বাঙালি ঘেঁষা তখন বক্তা তরুণীদের একজন এসেছে জিন্স আর শার্ট পরে। জাকিয়া খান একটু বিব্রতবোধ করলেন; কিন্তু করার কিছু ছিল না। অনুষ্ঠানের বক্তব্য সবই বাঙালিসুলভই হলো। দুই তরুণীই সর্বগুণে গুনান্বিতা হয়েও মার আনুগত্য ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করল এবং মায়েরাও জানালেন, বর্তমানে সর্বাধুনিক যুগ প্রক্রিয়ায় মায়েদেরও উচিত পুরাতন মতবাদ বিশ্বাসে কিছু ছাড় দেয়া। তবে যুগের সঙ্গে যত তাল দিয়েই উঠুক না কেন বাঙালির বাঙালিত্বটুকু মনে রাখতে হবে।

মাঝে একবার বেরিয়েছিলাম। জাকিয়া খান আসার দিন থেকে লেগে আছে ইন্টারভিউর জন্য। সেটি শেষ করে লবিতে দেখা পেয়ারীর সঙ্গে। আজই চলে যাচ্ছে জার্মানিতে।

পড়ন্ত বিকেলে আর একবার মেলার প্রাঙ্গনে এলাম। বই-এর স্টলগুলো জমল কিনা। হতাশ হতাশ। বই ছাড়া সব আছে। প্রচুর হৈ চৈ। সবার মুখেই প্রায় অভিযোগ বই মেলায় বই নেই, এ কেমন ব্যাপার। আর একদল বলছে, টিকেটের দাম বেশি। কে এত খরচ করবে পরিবারসহ মেলা দেখতে এসে টিকেটে। তার চেয়ে সে টাকায় ঘুরে ফিরে, রেস্তোরাঁয় ডিনার সেরে বাড়ি ফিরব। দর্শক মুখে যাই বলুক রবীন্দ্র মঞ্চে কিন্তু জায়গা নেই। দু'হাতে টিকেট বিক্রি হয়েছে আয়োজকদের। আবদুলস্নাহ আল মামুনের রচনা নাটিকা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক। মাত্র দুটি চরিত্র। অভিনয় করলেন জামালুদ্দিন হোসেন ও রওশন আরা হোসেন। উদীচী প্রযোজিত শাহীন খান অভিনীত প্রায় ম্যাটাফব ধর্মী নাটক 'সুখের লাগিয়া'। বিশ্বজিৎ-এর ধন্যবাদ জ্ঞাপন। তারপর শুরম্ন হল হাবিবের একক সঙ্গীত। সে ডায়াসে আসতেই তুমুল করতালি। নিউ ইয়র্কে তার প্রথম আসা। টিনএজারদের নাচানাচি আর ফ্লাইং কিসে বোঝা গেল 'ভালোবাসব বাসবোরে' ঝড় ভালোই উঠেছে।

বারোটায় হল ছেড়ে দেবার শর্ত না থাকলে জোশে হয়তো রাত কাবারই হয়ে যেত। সেই একটি দরোজা খোলা কালকের মতো। আজ আবার বৃষ্টি মাথায় ঢুকেছিলাম, শো শেষেও সমান তালে ঝরছে। বিশ্রী পরিস্থিতি।

সামনের সপ্তাহে ডালাস যাওয়া। মাঝে কয়েকটা দিন ফ্রি। শহীদ কাদরীর ফোন হয়ত রাতে এসে থাকবে। আজ তার হাসপাতালে থাকার কথা। গোটা দিন কাজে লাগালাম শপিং মলগুলোতে। কুইন্স থেকে জিনিষ কালেক্ট করতে অনু গেছে। আমি কাউন্টারে কার্ড দিয়ে দাম মেটাচ্ছি। প্রশ্ন এলো, কোত্থেকে এসেছ?

বাংলাদেশ।

সেলস বয় সাতাশ-আটাশ বছরের এক আমেরিকান যুবা। আমার জবাবের সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, খুব গোলমেলে দেশ তোমাদের।

সারা পৃথিবীতে গোলমাল কোথায় না হচ্ছে বলতে পার। বেশির ভাগই আবার তোমরা লাগাও।

আমরা বলতে আমজনতাকে আবার বুঝিও না।

সে চুইং গামের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল- নাও।

আমি মাথা নাড়ালাম- ধন্যবাদ। ওটা খাই না।

পাওনাগুলো বুঝে নিয়ে সে হাসলো- গুড নাইট রাবেয়া।

আমি শুরম্নতে অবাক। কার্ডে সব সময় বাংলায় নাম সই করি। মাথা খুলল পরড়্গণে, ইংরেজিতেও রয়েছে। তবু অত কম বয়সী কারম্ন মুখে নাম শুনতে আমাদের কান ঠিক অভ্যস্ত নয়।

রাত আটটার দিকে আমাদের দাওয়াত। ড. আনিসুজ্জামানের পুরনো বন্ধু ড. মাহফুজুর রহমানের ওখানে। ম্যানহাটন এপার্টমেন্ট বাড়িটার নাম ওয়াটার সাইড। প্রকাণ্ড ম্যানসন। তিনি যেটায় থাকেন তার জানালা থেকে টুইন টাওয়ার দেখা যায়। (যদিও কয়েক কিলোর দূরত্ব মাঝে)। সব ক'টা ঘর বলতে গেলে বই-এর কালেকশন সেই ঘরের জানালায় আমাদের নিয়ে গেলেন যেখান থেকে টুইন টাওয়ার দেখা যেত। সম্ভবত শোবার ঘর কিন্তু চারদিকে ছড়ান শুধু বই আর বই। তিনি বললেন, আমার এক বন্ধু ফোনে যখন জানালেন সৌভাগ্যবশতঃ তখন ক্যামেরাটা ফিল্মভরা ছিল। আমি একটার পর একটা ছবি তুলতে লাগলাম। তারপর কালো ধোয়ায় সব অস্পষ্ট হয়ে গেল।

জাতিসংঘে কাজ করতেন। ছবি তোলা তার হবি।

খুব যত্নে খুব সুন্দর করে ছবিগুলো অ্যালবামে রেখেছেন। দেখালেন। সেই সঙ্গে দেখালেন জানালার ধারে তাজা বেলী ফুলের গাছ। বললেন, ক'দিন আগেও অনেক ফুটেছিল। এখন দুটো একটা আছে।

বাংলাদেশের ফুল নিয়ে তার প্রকাশিত বইও দেখালেন।

আমি ভাবছিলাম টাওয়ারের কথা। প্রথম যেবার আমেরিকা আসি দুবার উঠেছিলাম ওই বিল্ডিং-এ। পরের বার এসে দেখেছিলাম ধ্বংসস্তুপের স্মৃতি। ধনী দেশ দুদিনও লাগে না ক্ষতি সামলে উঠতে। কিন্তু আজও যে কেন তেমন কিছু উঠছে না, পৃথিবীর বড়ো কুটনীতিবিদ আমেরিকান কর্মকর্তারাই জানেন। যা জীবন্ত করে রাখার রহস্য।

ফাহিম, অনু গেছে গাড়ি আনতে। ড. জামান, তার স্ত্রী, আমি হাসছি অতীতের একটা চ্যাপ্টার নিয়ে। আনিসুজ্জামান শান্তিনগরে আমাদের প্রতিবেশি ছিলেন। কিন্তু কখনো দেখা হয়নি। বিয়ের পর প্রথম দেখা হলো গুলিস্তানের উল্টো দিকের ফুটপাথে। তখন তাকে চিনতাম বিষাদ সিন্ধুর অমর লেখক মীর মোশাররফ হোসেনের নাতি হিসেবে। থাকতেন সম্ভবত ঠাটারিবাজার। তিনি যাচ্ছিলেন, আমি ওদিক থেকেই আসছিলাম। স্টেডিয়ামের ফুটপাথে সেদিন কি কথা হয়েছিল মনে নেই। তারও মনে নেই। স্মৃতি রোমন্থিত হলো কিছুক্ষণ ম্যানহাটনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে।

ম্যানহাটনের রাত্রি আমার কাছে যতবার এসেছি ততোবারই মনে হয়েছে মোহময়। এত আলো, আয়োজন, জনরব, হাসি নিশিরাতকে যেন করে রাখে প্রমোদময়। যেদিকেই তাকাও শুধু আনন্দ। বিষাদকে জয় করা রাত্রি মনে করিয়ে দেয় প্যারিসের সাজালিজের নিশিযামের চমৎকার স্মৃতিকে।

রাত দুটোয় বাড়ি ফেরা। বেলা করে ওঠা এবং শহীদ কাদরীর ফোন পাওয়া। কণ্ঠস্বর আগের মতোই মনে হলো। তবে খুব বিমর্ষ- আপনি আসতে চেয়েছেন শুনে কত ভালো লাগছে। কিন্তু আসতে পারবেন কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে। শুনেছেন বোধহয় কত কত রোগে ভুগছি। ডাক্তারের কাছেই আজকাল সময়গুলো যাচ্ছে। একটা অপারেশন আছে আজ। তারপর কেমন থাকবো জানি না। যদি কিছুমাত্র সুস্থ থাকি, বোধের মধ্যে থাকি জানাবো। কালও এই ধকল যাবে। যাচ্ছে গত কিছুদিন থেকেই, এখন মনে হচ্ছে কবে আছি, কবে নেই।

তা কেন? আমাদের তো মনের জোর অত্যন্ত বেশি। নিশ্চয় আপনি সে জোরেই ভালো হয়ে উঠবেন।

কে বলতে পারে হয়ত আর দেখাই হবে না।

কে বলতে পারে হয়ত কাল পরশুই দেখা হয়ে যাবে।

কি জানি।

মনে হলো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর থেমে থেমে ক্লান্ত স্বরে আবার শুরু করলেন, আপনার মনে আছে কিনা জানি না কিন্তু আমার এখনো মনে আছে আপনি আর ফজলুল হক সিনেমা পত্রিকা বের করতেন। একটা আড্ডা হতো। আহসান হাবীব, কাইয়ুম চৌধুরী, ওবায়দুল হক, শামসুল হকরা যেতেন। আমি তখন থাকি আপনাদের পাড়াতেই। তবে স্কুলে পড়ি। শামসুর রাহমানদের মতো যুবক নই। বাড়ির পাশ দিয়ে যেতাম কিন্তু সাহস করে কখনো এক তলার সিঁড়ি ভাঙতে পারতাম না। আপনার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল একাত্তরে মনে আছে।

স্পষ্ট মনে আছে। লম্বা চওড়া আপনি হাসান হাফিজুর রহমান পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

হাঁ তখন আমি পূর্ণ যুবক। আমরা সবাই। তোপখানা রোডের একটা বাড়িতে রোজ নাকি দুচার দিন পরপর মিটিং বসত। মেয়েরা আসত চওড়া লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে। মাঝে মোমবাতি জ্বেলে সবাই

গোল হয়ে বসতাম। আলোচনা চলত পাকিস্তানীদের নিয়ে। কি হবে, কি ঘটতে চলেছে, আমাদের কি ভূমিকা।

আমি চুপ করে অপেক্ষা করছি তার কথার জন্য। কিছুক্ষণ বিরতিতে আবার বললেন, সেই মিছিলটা- বাংলা একাডেমি থেকে বেরিয়ে বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে হাত তুলে সবাই শপথ নিয়েছিলাম পাকিস্তানীদের এদেশ থেকে তাড়াব।

এই অসুস্থতার মধ্যেও তার স্মরণ শক্তি আমায় অবাক করছিল। বললেন, মার্চের সেই যে একটা দিন বাংলা একাডেমির বটতলায় জম্পেস উত্তেজক কবিতা পাঠের আসর হলো। আমি এবং আমরা অনেকে কবিতা পাঠ করলাম। শামসুর রাহমানের সেই বিখ্যাত কবিতাটি সেদিন সে পড়েছিল, তবে কি গোটা দেশটা হয়ে যাবে শহীদ মিনারঃ বোধহয় সবাই মিলে সেদিন চিৎকার করেছিলাম, কুকুরগুলোকে তাড়াও পথ থেকে। পাকিস্তানী কুকুর। সত্যি তাড়াতে পেরেছিলাম কিন্তুঃ

চুপ হয়ে গেলেন। প্রশ্ন অনেকগুলো ছিল দেখা হলে বলব। কিংবা তখনই বলতে পারতাম তার নিবিড় বেদনাঘন আচ্ছন্ন স্বর আমায় ঠোঁট খুলতে দিল না। শুধু বললাম, আপনার তো খুব কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে?

ওপাশ থেকে ভেসে এলো, হচ্ছে তবে ইচ্ছেও করছে নষ্টালজিয়ায় ফিরে যেতে। কাল কিংবা পরশু যদি কথা বলার মতো অবস্থায় থাকি আবার ফোন করব।

আপনি কেন থেমে গেলেন। কার ওপর অভিমান?

নাঃ প্রশ্নটা আমার মধ্যেই থেকে গেছে। আমি অপেক্ষা করেছি। তিনি আর ফোন করেননি। তার অর্থ কথা বলার অবস্থার মধ্যে তিনি নেই। অসুস্থ যাই হোক, অপারেশন যত বড়ই হোক তিনি সেরে উঠুন।

আমাদের হাতেও খুব বেশি সময় তো নেই। ডালাস, হলিউড, মানে লস এ্যাঞ্জেলসে যেতে হবে শুক্রবার। অথচ কোথায় টিকিট কোথায় প্রোগ্রাম? বিশ্বজিৎ-এর টিকিটের খোঁজ নেই। আমরা তো মূলত তার গেস্ট। তার অনুরোধেই ফাহিম অনুরা প্রীত মনে আমাদের আতিথ্য দিয়েছে। ব্যাপারটা আমাদেরও ভালো লাগছে না। অমন যে আনিসুজ্জামান, কোনো ব্যাপারেই যিনি অসন্তুষ্ট নন, অসহযোগী নন তিনিও বুঝি একটু বেকায়দায়। বললেন, বিশ্বজিৎ এটা কি করছে? কার সঙ্গে যাব, কোথায় মিট করব কোনো ধারণা নেই। একটা নকল লিস্টের কপি আমায় দিয়েছে মাত্র। তার মধ্যে আপনার নাম নেই।

অথচ ওকে বলেছিলাম আমি আপনার সঙ্গেই যাব। আমার লিস্টে ১২/১৩ জনের নাম আছে। দ্বিতীয় লিস্টে বোধহয় আপনার আনিসুল হক বাবুরা আছে।

লিস্ট তো পাঠাব।

হ্যাঁ। আমার কাছে যেটা দিয়েছে মানে আমি নিয়ে এসেছি স্পষ্ট করে আর কিছু লেখা নেই। বিশ্বজিৎ এটা কি করছে? অনু ঠাট্টা করে বলল, হাবিবের শোতে অনেক রোজগার করে ওর মাথা ঠিক নেই।

সমরেশের ব্যাপারটাও আমাদের মতো। সেও ভুগছে অনিশ্চয়তায়। হোটেল ছেড়ে তাকে ওঠান হয়েছে কার বাড়িতে যেন। তবে আমি আশা করছি এর মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মঞ্জুর সাগরের বন্ধু তার বাড়িতে আমাদের জন্য একটা পার্টি থ্রো করল। এ বিষয় নিয়ে যেটুকু আলোচনা হলো স্থানীয় জনেরা বিশ্বজিৎ সম্পর্কে নানা নেতিবাচক মন্তব্য ঝারল।

গলায় পাথরের মালা, বয়েস অল্প হলেও বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি মেয়ে এল আলাপ করতে, আপনার নাম তো অনেক শুনেছি, মেলায় আলাপের সুযোগ হয়নি।

আগে দেখিনি কিন্তু চিনলাম সেই চিত্র শিল্পী মেয়েটি তার ছবি নিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে। বাংলা উৎসবের লিস্টে তার প্রদর্শনীর কথা আছে। কিন্তু বাস্তবে তার ব্যবস্থা করা হয়নি।

দুঃখ করে অনেক কথার মধ্যে মেয়েটি বলল, এখানে তো কথা দিয়েও কথা রাখল না। এখন বলছে ডালাস, এল এ, নিউ জার্সিতে হবে। আমি তো খুব একটা ভরসা পাচ্ছি নাঃ ঢাকার বই নিয়ে কথা তুলল। আপনাদের নাম শুনি কিন্তু কারো বই আমরা পাই নাঃ

ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি ভাবছি অন্য কথা। শেষ পর্যন্ত হয়তো সবারই যাওয়া হবে; কিন্তু এত অবহেলা কেন? এতই কি ঠেকা পড়েছে যাওয়ার? নিউ ইয়র্ক এনে ফেলে বিশ্বজিৎ ভাবছে এনে তো ফেলেছি এখন যেমন চালাব তেমনি চলবে সবাই। মন স্থির করে ফেললাম আর কোথাও যাবো না। সোজা ঢাকা।

বিশ্বজিৎ-এর সমস্ত মনোযোগ হাবিব এবং টাকায়। হাবিব অবিশ্যি তরুণ স্টেজ মাতান চমৎকার পারফর্মার। কিন্তু বিষয় বিশ্বজিৎ-এর অন্যদের প্রতি ব্যবহার।

সকালে উঠে ফাহিমকে দেখি (যেদিন বিকালে অফিস থাকে) টেবিলে বসে লিখছে। এখানে নাকি ভালো কোনো দৈনিক পত্রিকা নেই। বেশ কটি বাংলা সাপ্তাহিক বের হয়। ফলে গড়ে রোজই একটা না একটা কাগজ ঘরে আসেই। ও তারই একটার জন্য ধারাবাহিক লেখা লেখে।

সেদিন দেখলাম ভোরের আসর বেশ জমে উঠেছে। আনিসুজ্জামান গল্প করছেন বেশ রসিয়ে রসিয়ে- মেহমান তো আর বাড়ি ছাড়ে না। গৃহস্বামী তাকে নানাভাবে তাড়াবার চেষ্টা করেন। প্রথমে বালিশ, তারপর কম্বল, তারপর খাবারে এদিকে ওদিক করতে লাগলেন, তাও অতিথি নড়ে না। শেষটায় গৃহস্বামীর ছোট মেয়ে মেহমানকে প্রশ্ন করল, কাকা আবার আসবেন তো?

অতিথি উৎসাহে মাথা নাড়ে, নিশ্চয় নিশ্চয়।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, কিন্তু এবার গেলে তো আবার আসবেন-

হাসির বন্যা বয়ে যায়। তার মধ্যে যাবার কথা তুলি।

ফাহিম একটু সংকোচের মধ্যে বলে, কিন্তু এটা কি ভালো দেখাবে?

আমিও বুঝি। দেখাবে না। কিন্তু এমন পরিস্থিতি ফেস করতে আমি অভ্যস্থ নই।

আমার কথার পিঠে আনিসুজ্জামান বলেন, এমন অবস্থায় আপা যদি মাঝপথে ফিরে যান আমি অন্তত তাকে দোষ দিতে পারি না।

মনের ভেতর পাকাপোক্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু অতদূর থেকে ফিরব বললেই কি ফেরা যায়? আমার রিটার্ন টিকেট কনফার্ম হয়ে আছে আনিসুল হকের সঙ্গে ১৮ জুলাই। আজ মাত্র ৫ তারিখ। তারপরও সমস্যা রয়েছে। সাগর আমি বাইরে এলে প্রতিদিন একবার ফোন করে। কোনো দিন দু'তিন বারও হয়ে যায়। ওকে জানালে হঠাৎ করে ওই বা কাকে পাবে যে আমার সঙ্গে যাবে। আমি আবার একা ট্যুর করতে পছন্দ করি না। তার ওপর আমার রয়েছে বিজনেস ক্লাশের টিকেট। লোক পাওয়া গেলেও টিকিট খাপ খাবে না। তবু বলি তো সাগরকে। ব্যবস্থা সে একটা করবেই। (যদিও প্রায় অসম্ভব সব মেলান)। এমন করে থাকতে পারব না।

সেদিন তিনবার কথা হলো সাগরের সঙ্গে। শেষবার বলল, পাওয়া গেছে। রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যা

আগামীকাল নিউ ইয়র্ক যাচ্ছে। পরশু ওর প্রোগ্রাম নিউ জার্সিতে। ওরও বিজনেস ক্লাশের টিকেট। বার তারিখ সব কিছু ভাবার নেই। এখান থেকেই সব ব্যবস্থা আমি করবঃ

সামনে অনেকগুলো বড় বড় সমুদ্রের ঢেউ দেখছিলাম। সাগর সব শান্ত করে দিল। মনের আনন্দে এবার জিনিস গোছাব। মাঝের ক'দিন থাকব নিউজার্সি আত্মীয়ের বাড়ি। বেবী আপা (যদিও বয়সে অনেক ছোট) বললেন, আমার ছোটবোনের বাড়ি যাবার কথা। আনিস তো চলে যাবে এল এ, ডালাস। আপনার সঙ্গে আমিও যাব। ওদের আসার যেন কি অসুবিধা হয়েছে। আমিও তৈরি হই।

অনু ফাহিম তাদের ছেলে তন্ময় অবিশ্যি মন খারাপ করল। অনু বলল, আপনারা থাকলে কত ভালো লাগত। কটা দিন আনন্দে কাটল। আবার সেই আমরা তিনজন। আপনাদের দুজনের কাছেই আবার বলা থাকল, তন্ময়ের জন্য পাত্রী দেখবেন।

মোটে ৩ বিশ বছর বয়েস। এখনি পাত্রী কিসের। ছেলে তো তোমার ছায়ায় ঘোরে সারাক্ষণ।

সেটা সত্যি। কিন্তু একটাই তো ছেলে। ওকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চাই বাঙালি মেয়ের সঙ্গে। আপনারা পিস্নজ দেখবেন।

সকালে আনিসুজ্জামান রওনা হলেন এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। সম্বল সেই নকল লিস্ট। বললেন, বিশ্বজিৎ তো কোনো যোগাযোগ করল না। যাচ্ছি বটে ফিরেও আসতে পারি।

ভোরবেলা তিনি গেলেন। ১১টার দিকে বিশ্বজিৎ-এর ফোন। যা ওর অভ্যাস। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আপনাদের আসার তারিখ আগামীকাল। আপনি নাকি আসবেন না।

ইচ্ছেমতো কথা শুনিয়ে বললাম, তোমার একটা জবাব পাওয়া উচিত। বই মেলায় বই নেই, লেখকদের খোঁজ খবর নেই। এটা কি কোনো ভদ্রলোকের ব্যবহার। তারা কি বাণের পানিতে ভেসে এসেছিল। না তুমি পায়ে ধরে এনেছিলে।

বিশ্বজিৎ পুরনো কৌশলের আশ্রয় নিল। ডালাসে ওর যে বোনের বাড়িতে গতবার ছিলাম তাকে দিয়ে ফোন করাল। সেই মেয়েটি সত্যি খুব যত্ন নিয়েছিল শীর্ষেন্দু আর আমার। এবারও অনুনয় করে আসতে বলল। আমি দুঃখ প্রকাশ করলাম।

বিশ্বজিৎ বলল, ছোটরা অপরাধ করলে বড়রা কি মাফ করে না।

করে। তবে যেটা অমার্জনীয় তা ক্ষমা করা যায় না। তুমি কান্নাকাটি করেছিলে বলে সাগর নিজে আমার টিকেট করে দিয়েছিল। আছি অনুর বাসায় তারপরও তোমার এতটুকু সৌজন্য বোধ নেই। আগামীকাল আমি যে যাব এইমাত্র তুমি আমায় জানালে। এত অনিশ্চয়তার মধ্যে তুমি কি করে আশা কর আমি অন্যান্য জায়গায় যাব।

এবারের মতো মাফ করম্নন। আমার অনেক অপরাধ পিস্নজঃ

ওর কথায় আর কান দেইনি। ঢাকায় ফিরে আনিসুল হকের কাছে শুনেছিলাম- না গিয়ে ভালোই করেছেন। আনিসুজ্জামান স্যার বা আপনার তেমন করার কিছুই ছিল না। বিশ্বজিৎ ব্যস্ত হাবিবকে নিয়ে। আনিসুজ্জামান ভোরে গেলেন বেবী আপা আর আমি বিদায় নিলাম সন্ধ্যায়। ওয়ালিদ নিউজার্সিতে নতুন বাড়ি করেছে। চাকরি নিউ ইয়র্কে। রোজ অফিস করে এই এতটা পথ ভেঙে। ফেরার রাস্তায় আমাদের নিতে হলো। বেবী আপা শুধু ভালো মানুষ নন; রসিক মানুষও। সারাটা সময় কথায় কথায় মাতিয়ে রাখলেন।

ওয়ালিদ ওর বৌ এ্যানি রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাল। নতুন বাড়ির প্রথম মেহমান আমি। ওয়ালিদের ওপর

ভার দিয়েছে বন্যাকে খুঁজে বের করার। এদিকের কোথাও তার গান হবে কিন্তু কাছাকাছির কেউ বলতে পারল না।

অনেক চেষ্টা করে জানা গেল সেই গ্রুপের নাম কলেস্নাল গোষ্ঠি যারা ওকে ঢাকা থেকে আনিয়েছে ব্রিজ ওয়াটারে। শো ১০ তারিখে। সেদিন সকালে বন্যা ফোনও করল। এসেছে টিকিট অলরেডী সব বিক্রি। মোবাইলে বন্যা বলল, তাতে কি হলো। গেস্টদের জন্য সামনের রোতে ২০টি সিট থাকে। আপনারা তো মোটে ৫ জন। আমি অশোকদাকে বলে রাখব। নিশ্চয় আসবেন।

দুপুরে গল্প করতে করতেই বেজে গেল তিনটা। খেতে খেতে চারটা। শো পাঁচটায়। বেরিয়ে পড়া গেল। ওয়ালিদ ব্রিজ ওয়াটার চেনে না। এপথ, ওমোড় ঘুরে অবশেষে সেখানে পৌছলাম। একটা স্কুল বাড়ির অডিটোরিয়ামে ১১টা থেকে অনুষ্ঠান হচ্ছে। তখন বিরতিতে দর্শকদের খাওয়া চলছে। বিরিয়ানি, রেজালা, জর্দা।

মধ্যবয়সী অশোক বাবুকে পাওয়া গেল। তিনি সমাদরে আমাদের জন্য রাখা সিটে নিয়ে গেলেন। এদের শেষ প্রোগ্রাম রবীন্দ্রনাথের শ্যামা নৃত্যনাট্য। কলকাতা থেকে নায়ক ও সহ-নায়কের জন্য আনা হয়েছে নর্তক মনোজ পাল এবং সৌরভ রায়কে। নায়িকার রোলে রয়েছে এ দেশেই থাকে সূচন্দা পাল। একটু বয়স্ক। কিন্তু শরীরের গড়ন এবং নাচের দক্ষতা সেটা ভুলিয়ে দেয়। স্টেজ রূপসজ্জা প্রশংসা করার মতো। নায়িকার কণ্ঠে সবগুলো গান বন্যার। নায়কের আশোক দাশ। পরিচালনাও তার। বহু দেখা শ্যামাকেও মনে হলো নতুন দেখছি অপূর্ব পরিবেশনার গুণে।

নিউজার্সিতে তিনদিন ছিলাম। ছোট্ট শহর। পরিস্কার গাছ গাছালিতে সাজান। প্রকৃতি দত্ত তার সোন্দর্য। বাড়িঘর পস্ন্যান্ডওয়েতে করা। জনসংখ্যা খুবই কম। স্বয়ং সম্পূর্ণ শহর। সকালে বন্যা ফোনে জানিয়েছে সে নিউ ইয়র্ক ফিরে যাচ্ছে। ওখানেই দেখা হবে। আমরা দিনান্তের জন্য বেরম্নলাম। ওখানেও নিউ ইয়র্কের বড় বড় শপিং মলের শাখা আছে। অল্প কিছু কেনাকাটার পর একটা চাইনিজ দোকানে ঢোকা। খাবার ভালো। ফরচুন কুকির আমারটায় উঠেছে 'আপনি আরো সফলতার দিকে যাবেন।' আসলে সবারটাতেই আশাবাদের বানী।

হিন্দি সিনেমা পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে যাচ্ছে না। শাহরম্নখ-অমিতাভের ছবি চুটিয়ে চলে। এখানেও কিংখানের কি যেন চলছে। টিন এজাররা সে সব দেখতে পাগল। বাবা মাদের মাথায় হাত- হিন্দি কালচারের বিশ্বজয় করতে আর বাকি নেই। রক্ষা একটা বয়সে চলে গেলে আগ্রহবোধটা কমে আসে।

পরদিন ভোরে ভোরে উঠেছি। বাচ্চারা স্কুল ড্রেসে তৈরি। ওদের নামিয়ে আমরা চলে যাব নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্ট। ৮৫ কিলোর দূরত্ব। পথে ভিড় নেই। রাজপথ যেন আমাদের।

বন্যাও পৌছাল প্রায় একই সময়ই। ওর ছেলের পরীক্ষা। আজ যাচ্ছে আবার আসতে হবে মাসের শেষের দিকে। বেশ আছে ও। বছরের বেশির ভাগই কাটে বিদেশে।

এয়ার আমিরাত রাইট টাইমেই ছিল। বন্যার সঙ্গে গল্প করতে করতে কখন চলে যাব টেরও পাব না। যেন পৌছেছি দুবাই। কখন ঢাকা।

লেখাটি দৈনিক ইত্তেফাক থেকে ধার নেওয়া... সম্পাদক মুন্সীগঞ্জ